বণিক বার্তা

বাংলাদেশে সংযুক্তি ও অবকাঠামোর দেখভাল

সাজ্জাদ জহির | ২০১৫-০৬-০৬ ইং

বাংলাদেশ কী কারণে বহির্বিশ্বের কাছে আকর্ষণীয় হতে পারে? মোটাদাগে চারটি কারণ চিহ্নিত করা সম্ভব— ১. স্বল্প মজুরির শ্রম ব্যবহার করে পণ্য উৎপাদন; ২. এখানকার জলে-স্থলে কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, জ্বালানি তেল বা অন্য কোনো দুর্লভ খনিজ প্রাপ্তির সম্ভাবনা; ৩. আঞ্চলিক সংযুক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজন এবং ৪ আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান সামরিক বা নিরাপত্তা কৌশলের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে। লক্ষণীয় যে, পণ্য উৎপাদনে বিনিয়োগ, জ্বালানির সহজলভ্যতার কারণে অথবা স্বল্প দূরত্বের আঞ্চলিক বাজারে অনুপ্রবেশের সুবিধার কারণেও হতে পারে। এমনকি পরিবেশ ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পরিবেশদূষণকারী শিল্প বাংলাদেশে স্থানান্তর হতে পারে। জ্বালানির সহজলভ্যতা যেমন বিনিয়োগকে আকর্ষণ করতে পারে, তেমনি আঞ্চলিক সংযুক্তির উন্নতিসাধন পরিবহন খরচ কমিয়ে বিস্তৃত বাজার নিশ্চিত করলে বিনিয়োগ বাড়তে পারে। তবে দুটো ক্ষেত্রেই ভিন্ন সম্ভাবনাকে বাতিল করা যায় না। জ্বালানি পাওয়া গেলেই যে তা এ ভূখণ্ডে ব্যবহার হবে, তার নিশ্চয়তা নেই এবং আঞ্চলিক সংযুক্তি বাড়লেই এখানকার উৎপাদিত পণ্যের বাজার নিশ্চিত করতে নাও পারে। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দৃঢ়তার ভূমিকা এখানে গুরুত্বপূর্ণ।

নানা পথের প্রবেশমুখে বহু সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আমাদের সমাজ ও রাজনীতি অনিশ্চয়তায় ভুগছে। শক্তিশালী প্রতিপক্ষের মধ্যে সমঝোতার অভাব সম্ভবত এর একটি কারণ। কোন দ্বারে আমরা প্রবেশ পাব এবং স্থানীয় সমাজের অটুটতা অক্ষুণ্ন রেখে বাইরের শক্তিকে সম্মানের সঙ্গে মোকাবেলা করার জন্য আমাদের অভ্যন্তরীণ ঐক্যের সুদৃঢ়তার ওপর সে নিয়তি নির্ভর করবে। যেহেতু সম্পদ স্থানান্তর, বাজার সংযুক্তি ও নিরাপত্তা কৌশলের

প্রয়োজনে যোগাযোগ ব্যবস্থায় এবং সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোয় বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়, তাই কী ধরনের যোগাযোগ ও অবকাঠামো প্রকল্প কার্যকর (বাস্তবায়ন) হচ্ছে এবং কোনগুলো থমকে দাঁড়িয়ে থাকছে, সেগুলো নজরদারিতে আনলে সমাজ ও অর্থনীতি কোন পথে এগোবে, তা আঁচ করা সম্ভব। সে অনুমানে পদ্মা-মেঘনা-ব্রহ্মপুত্রের এ অববাহিকার আগত দিনের সমাজ-রাজনীতি সম্পর্কে সীমিত ধারণা এ নিবন্ধে উল্লেখ করছি।

আইলাবিধ্বস্ত দক্ষিণাঞ্চলের বিশাল এলাকায় পানি নিয়ন্ত্রণের সুব্যবস্থা আজ অবধি করা হয়নি। একই সঙ্গে রামপালে বিদ্যুকেন্দ্র স্থাপনের ফলে সুন্দরবন বিলুপ্তির সম্ভাবনা মহাপরিকল্পনার প্রতি ইঙ্গিত দেয়। চীনা অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ ও গজারিয়ায় শিল্পাঞ্চল তৈরির কাজ চলছে। সাবমেরিন নোঙর করার উদ্দেশ্যে পায়রা বন্দর একটি ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্প। সোনাদিয়ায় গভীর সমুদ্র বন্দর এবং পৃথকভাবে এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ সম্ভবত ২০২০ অবধি অপেক্ষা করতে হবে। মেট্রোরেলের কাজ প্রাথমিক পর্যায়ে, অথচ ফ্লাইওভারের কাজ শুরু হওয়ায় মেট্রোরেলকেন্দ্রিক পরিকল্পনা বিঘ্নিত। ঢাকা বিমানবন্দর থেকে জয়দেবপুর অবধি বাংলাদেশ সড়ক পরিবহনের ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ প্রশস্ত রাস্তা ও ফ্লাইওভারের প্রকল্প ময়মনসিংহ হয়ে জামালপুর পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ার কথা এবং জয়দেবপুরে টার্মিনালের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

ভারতীয় ঋণে রেলপথ পুনর্গঠনের জন্য প্রাথমিক পরিকল্পনায় কিছু দিক পরিবর্তন লক্ষণীয়। আগরতলা-আখাউড়া ও আখাউড়া-লাকসাম রেলপথ সংযোগের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। লাকসামে (দুই লাইনের) ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথের সঙ্গে যুক্ত হলে এ বিনিয়োগ ত্রিপুরাকে চট্টগ্রামের সঙ্গে সংযুক্ত করবে। বাংলাদেশের নদী ও সমুদ্রসীমানা দিয়ে নৌযান চলাচল-সংক্রান্ত বাংলাদেশ-ভারত চুক্তি কয়েক দিন আগে একনেকের অনুমোদন পেয়েছে। আশুগঞ্জে নৌ-টার্মিনাল স্থাপনের ওপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

সমুদ্রে বাংলাদেশ সূত্রে জ্বালানি তেল পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ মনে হয় এবং গভীর সমুদ্রের সীমানা নিয়ে আইনি লড়াইয়ে কী লাভ হলো, তা কেউ আর আলোচনা করে না। সঙ্গত কারণেই বিদ্যুৎ প্রাপ্তির প্রতি অধিক নজর লক্ষ করা যায়। মাতারবাড়ীর বিদ্যুৎ চক্রকেন্দ্রের আলোচনা তুলব না, কারণ তা সময়সাপেক্ষ এবং তা সামরিক কৌশলজনিত প্রয়োজনে ব্যবহার করা হবে, নাকি দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে শিল্পায়নের কাজে ব্যবহার হবে, তা জানার জন্য আমাদের আরো কিছু বছর অপেক্ষা করতে হবে। তবে আঞ্চলিক গ্রিডটি আজ বাস্তব। বহরমপুর-ভেড়ামারা সংযোগ ও পালাটানার বিদ্যুৎ আমদানির জন্য ত্রিপুরা-কুমিল্লার সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে; যা পদ্মা সেতু হলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল দিয়ে ভারতের মূলখণ্ডে প্রবাহিত হতে পারে। তার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কথা প্রস্তাবিত রামপালে উৎপাদিত বিদ্যুৎ। অনুমান করা হয়, সাগরদ্বীপের সমুদ্রবন্দর ও সম্ভাব্য নৌঘাঁটি নির্মাণে সে বিদ্যুৎ কাজে লাগানো হবে।

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক গ্রিডটি উত্তর পথে, যা অরুণাচল প্রদেশে উৎপাদিত জলবিদ্যুৎ হাইভোল্টেজ ডিসি বা এসি লাইন দিয়ে আসাম (বনগাঁইগাঁও), বাংলাদেশ (জামালপুর ও বড়পুকুরিয়া), বিহার (পূর্ণিয়া) হয়ে আগ্রা অবধি নিয়ে যাবে। ভুটান থেকে আসা বিদ্যুৎ বনগাঁইগাঁওয়ে এসে মেলার কথা এবং নেপালে তৈরি বিদ্যুৎ পূর্ণিয়ায় পশ্চিমমুখী গ্রিডটির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কথা। বড়পুকুরিয়ায় তৈরি বিদ্যুৎ এ গ্রিডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পশ্চিমমুখী হবে, নাকি তা দক্ষিণমুখী হয়ে বাংলাদেশের অন্যত্র বিদ্যুৎ জোগান দেবে, সেটা স্পষ্ট নয়।

উপরোল্লিখিত প্রকল্পাদি ও অন্যান্য তথ্য থেকে মনে হয়—

১. দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলের (নেপাল, ভুটান, উত্তর-পূর্ব ভারতের অরুণাচল) জলবিদ্যুৎ দীর্ঘস্থায়ী গ্রিড ব্যবস্থার মাধ্যমে পশ্চিমাঞ্চলের কলকারখানা ও বসতির চাহিদা মেটানোর জন্য নেয়া হবে। প্রাথমিকভাবে ত্রিপুরার প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে তৈরি বিদ্যুৎ বাংলাদেশে আমদানি হলেও পরবর্তীতে পদ্মা সেতু নির্মাণ হলে তা ভেড়ামারা-বহরমপুর দিয়ে

পশ্চিম বাংলায় প্রবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। এমনকি বাংলাদেশের কয়লা ব্যবহার করে অথবা কয়লা আমদানি করে বাংলাদেশের (উত্তর বা দক্ষিণ) পশ্চিমাঞ্চলে উৎপাদিত বিদ্যুৎ শেষাবধি কোথায় ব্যবহার হবে, তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়।

২. ঢাকা-চট্টগ্রাম চার লেনবিশিষ্ট সড়ক তৈরির বিলম্ব এবং পাশাপাশি আখাউড়া-লাকসাম রেলপথ নিয়ে ব্যস্ততা ঢাকাকে ঘিরে রফতানিনির্ভর শিল্পকে নিঃসন্দেহে বিপাকে ফেলবে।

৩. ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যে বাজারের সম্ভাবনা একসময় বাংলাদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির আশা জাগিয়েছিল, সেটা সম্ভবত অমূলক। যাত্রী পরিবহনের দিকে গুরুত্ব দেয়ায় মনে হয়, সেখান থেকে অভিবাসনকে উত্সাহিত করা হবে; যে উদ্যোগ সাধারণত, নির্দিষ্ট এলাকা থেকে সম্পদ আহরণের পাশাপাশি দেখা যায়। তবে বিদ্যুৎ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা গেলে বাংলাদেশের সীমিত কিছু এলাকায় শিল্প প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা রয়েছে।

৪. একসময় অনেকেই বাংলাদেশকে আঞ্চলিক যোগাযোগের সংযুক্তিস্থল হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে আশাবাদী ছিল। স্থলপথ দিয়ে (এশিয়ান হাইওয়ে দ্বারা) দক্ষিণ-পূর্ব বা পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সে আশা আজ নিতান্তই ক্ষীণ। এমনকি সমুদ্রপথেও সে সংযুক্তি ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে ভারতের মূল ভূখণ্ডের যোগাযোগে আটকে যেতে পারে।

মিয়ানমারের শোয়েতে চীনের জ্বালানি-তেল ও গ্যাসের টার্মিনাল গঠন বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় অঞ্চলের ভৌগোলিক-রাজনীতিতে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। গত জানুয়ারি ২০১৫ থেকে আমদানি করা জ্বালানি তেল ও রাখাইন প্রদেশের রাজধানী সিতওয়ের গ্যাস দুটো ভিন্ন পাইপলাইন দিয়ে চীনের কুনমিংয়ের শোধনাগারে প্রবাহিত হতে শুরু করেছে। সমকালীন ঘটনা থেকে মনে হয়, সে বিনিয়োগ রক্ষার্থে বা তা হুমকিতে ফেলতে বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনা দিন দিন বাড়ছে। সেই সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীনির্ভর সমাজ ও রাজনীতি জেঁকে বসার সম্ভাবনাটা প্রকট হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

এরই পাশাপাশি ট্রান্স-প্যাসিফিক পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্টের (সমঝোতা) আওতায় চিরাচরিত করপোরেট জগতের সম্মিলিত অর্থনীতিক আগ্রাসন, যা এ অঞ্চলের অস্থিরতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। মাত্র দুদিন আগে ট্রেড ইন সার্ভিসেস এগ্রিমেন্ট (টিসা)-সংক্রান্ত তথ্য ফাঁসে (http://www.commondreams.org/news/2015/06/03/wikileaks-strikes-again-leaked-tisa-docs-expose-corporate-plan-reshaping-global) বিষয়টি আরো প্রতীয়মান হয়। ভারত উল্লিখিত সমঝোতার সদস্যদেশ না হলেও 'কটন রুট'-এর নামে সেখানকার উদ্যোগকে অনেকেই সমগোত্রীয় মনে করেন। তবে এটাও অনস্বীকার্য যে, চীনের উদ্যোগে গঠিত অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংকে ভারতও অর্থ জোগান দিচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, অনেক বিশ্লেষকের মতে, টিসা ব্রিকস কথিত ব্রাজিল, রাশিয়া, চীন ও ভারতকে বাইরে রেখে প্রণীত। তাই দক্ষিণ এশীয় নাগরিক হিসেবে আমরা আশা করব, বিশ্বপরিসরের রাজনীতি-অর্থনীতিতে বেসামাল হয়ে ভারত যেন এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ইনস্টিটিউটের পরামর্শ অনুযায়ী (২০১৪ সালের মে মাসে প্রকাশিত জ্যঁ ফ্রঁসে গ্যত্রে রচিত 'কানেন্টিং সাউথ এশিয়া টু সাউথ-ইস্ট এশিয়া: ক্রস বর্ডার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট' দ্রষ্টব্য) বাংলাদেশকে এড়িয়ে 'চিকেন নেক' দিয়ে মনিপুরের ইমফল দিয়ে কলকাতা বন্দর থেকে সায়গন বন্দর পর্যন্ত দীর্ঘ সড়কপথের পক্ষে যুক্তি না খোঁজে। অথবা পারমাণবিক শক্তি পাওয়ার আশায় বাংলাদেশের কাপড় রফতানিকে জিএসপি সুযোগ না দেয়ার বৈমাত্রেয়সুলভ মার্কিন আমদানি শুল্কনীতির প্রতি সমর্থন না জানায়। বরং আমরা আশা করব, ধর্মের লেবাসে বিভ্রান্ত না হয়ে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষে রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারের নাগরিকত্ব করতে বাংলাদেশকে সহায়তা করে।

সমাপ্তি টানব কয়েকটি মন্তব্য করে। প্রথমত. যেকোনো ভৌগোলিক ও সামাজিক সত্তা স্বাধীনভাবে এগোতে পারে, যদি তার জলে-স্থলের সম্পদ সেখানকার জনবসতির জন্য সুদূরপ্রসারী সম্মানজনক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে। কিন্তু দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশের ইতিহাস দুঃখজনকভাবে বারবার পূর্বাঞ্চলকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। আমরা আশা করব, বাংলাদেশের বর্তমান সরকার সে ধারায় পরিবর্তন আনতে সক্ষম

হবে। দ্বিতীয়ত. বাংলাদেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষে ভারতীয় বিনিয়োগকে আকর্ষণ করার প্রয়াস থাকাটা স্বাভাবিক। তবে সে অজুহাতে, জামালপুর বা বড়পুকুরিয়া, মংলা কিংবা রামপাল অথবা আশুগঞ্জে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের নামে বাংলাদেশের দুর্লভ জমি ভারতকে ইজারা দিলে তা স্পষ্টতই প্রাকৃতিক বা জ্বালানি সম্পদের পশ্চিমমুখী প্রবাহকে সহায়তা করবে। এক্ষেত্রে সতর্কতা জরুরি। তৃতীয়ত. বড় প্রতিবেশী হিসেবে আমরা আশা করব, পণ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে এবং উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাজার পাওয়ার লক্ষে ভারতীয় বিনিয়োগকারীরা এবং ভারতের সরকার বাংলাদেশে অংশীদারিত্বমূলক যৌথ বিনিয়োগ উদ্যোগে আগ্রহী হবেন, যা সবার জন্য অধিক শান্তিপূর্ণ বন্ধনের পথ উন্মুক্ত করবে। চতুর্থত. চিরাচরিত পশ্চিমা শক্তি ও পূর্বের উদীয়মান শক্তির মধ্যে ভারসম্য রাখতে গিয়ে ভারতের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব যে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগে, অশান্ত রাজনীতির বেশে তার ভোগান্তি অনেক ক্ষেত্রেই বাংলাদেশকে পোহাতে হয়। আমরা আশা করব, দুর্লভ পানি, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য অত্যাবশ্যিক জ্বালানি এ দেশের সঙ্গে অংশীদারিত্বমূলক বিনিয়োগের মাধ্যমে ভাগাভাগি করলে আমরা এ এলাকাকে শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধশালী করে তুলতে পারব।

পরিশেষে মানতেই হবে, আমাদের সমাজ ও অর্থনীতির উন্নতি ও সার্বভৌমত্বের অটুটতা নির্ভর করবে কতখানি অর্থনৈতিক প্রজ্ঞা ও রাজনৈতিক দৃঢ়তার সঙ্গে যোগাযোগ ও পরিবহন খাতে প্রকল্প বাছাই এবং সততার সঙ্গে সেসব বাস্তবায়ন করা হয়, তার ওপর। সে প্রজ্ঞার নিদর্শন আমরা বাংলাদেশ সরকার ও তার রাজনৈতিক-প্রশাসনিক নেতাদের কাছ থেকে আশা করি। নিঃসন্দেহে সে নেতৃত্বের কাছে উভয় দেশপ্রেম ও পেশাদারিত্ব কাম্য।